শীতে বেগুন খেলে শরীরে পড়বে যে প্রভাব

শীতের অন্যতম একটি জনপ্রিয় সবজি হচ্ছে বেগুন। স্বাদ ও পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এই সবজি শুধু বাংলাই নয়, দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের রান্নায় একটি অপরিহার্য উপাদান। ভর্তা, ভাজি, তরকারি থেকে শুরু করে নানা ধরনের খাবারে এটি ব্যবহৃত হয়। তবে অনেকেই জানেন না, এই সাধারণ সবজিটির রয়েছে অসাধারণ স্বাস্থ্যগুণ।

কী সেই গুণাগুণ, চলুন জেনে নেওয়া যাক—
হার্টের জন্য উপকারী: বেগুনে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফ্ল্যাভোনয়েড হার্টকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস করে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সহায়ক : বেগুনে উপস্থিত উচ্চমাত্রার ফাইবার রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে। এটি ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়িয়ে ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য উপকারী হতে পারে।

ওজন কমাতে সহায়ক: কম ক্যালরি ও উচ্চ ফাইবার থাকার কারণে বেগুন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পেট ভরিয়ে রাখে। ফলে অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা কমে যায় এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে।

হজমশক্তি বাড়ায়: বেগুনের ফাইবার হজমশক্তি উন্নত করতে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। এটি অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়ক।

ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়: বেগুনে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট শরীর থেকে ক্ষতিকারক টক্সিন বের করতে সাহায্য করে, যা ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক হতে পারে।

ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে : বেগুনে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায় এবং বয়সের ছাপ দূর করতে সাহায্য করে।

হাড় মজবুত করে : বেগুনে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম থাকায় এটি হাড়

শক্তিশালী করে এবং অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি কমায়।

ব্রেন ফাংশন শক্তিশালী করে: বেগুনে উপস্থিত ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ায় এবং স্মৃতিশক্তি প্রখর করতে সাহায্য করে।

বেগুন শুধু খেতেই সুস্বাদু নয়, এটি অসংখ্য স্বাস্থ্যগুণসম্পন্ন একটি সবজিও।

এটি নিয়মিত খেলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকে এবং নানা রোগের ঝুঁকি কমে। তাই পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাসের অংশ হিসেবে বেগুনকে অবশ্যই ডায়েটে রাখা উচিত।
সতর্কতা

তবে কোনো জিনিসই অতিরিক্ত ভালো নয়। সে হিসেবে বেগুনও অতিরিক্ত খাওয়া ভালো নয়। এই বেগুনে অনেকেরই স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। তাই যাদের অ্যালার্জির সমস্যা রয়েছে তারা এটি থেকে বিরত থাকবেন। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তারপরেই বেগুন খান।

সূত্র: কালের কন্ঠ

হিমোগ্লোবিনের শূন্যতায় যেভাবে মিলবে মুক্তি

শরীরের রক্তকোষে এক ধরনের প্রোটিনই হচ্ছে হিমোগ্লোবিন। এটি রক্তের লোহিত রক্তকণিকায় থাকে এবং এর মাঝে প্রয়োজনীয় ঘনত্ব বজায় রাখে। আর এই হিমোগ্লোবিনের কারণেই রক্ত লাল হয়। এর মূল কাজ হচ্ছে— দেহের প্রতিটি অংশে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন রক্তের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া। আর রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে গেলে নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। এর মূল কারণ হচ্ছে— অ্যানিমিয়া। সে কারণে আপনার মাথাব্যথা, শ্বাসকষ্ট, দুর্বলতা ও ক্ষুধামন্দার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

সাধারণত পুরুষের দেহে হিমোগ্লোবিনের স্বাভাবিক মাত্রা থাকে প্রতি ডেসিলিটারে ১৩.৫ থেকে ১৭.৫ গ্রাম। নারীর থাকে ১২-১৫.৫/১৬ গ্রাম। এ ছাড়া অনেকের রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কম থাকে। তাই কিছু খাবার খেলে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ঠিক হয়ে যায়। এ জন্য আমাদের কোন খাবার খাওয়া উচিত, তা ভালোভাবে জানা প্রয়োজন।

কীভাবে রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বাড়ে, সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মেডিকেল নিউজ টুডেতে পুষ্টিবিদ এমন কিছু খাবারের নাম বলেছেন, যা রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াবে। যেমন—

হিমোগ্লোবিন উৎপাদনে লোহা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শরীরে লৌহের ঘাটতি রক্তে হিমোগ্লোবিন কমে যাওয়ার মূল কারণ। লৌহসমৃদ্ধ খাবারের মধ্যে রয়েছে— মুরগির কলিজা, ঝিনুক, ডিম, আপেল, বেদানা, ডালিম, তরমুজ, লাল আঙুর, ব্রকলি, কুমড়ার বিচি, খেজুর, জলপাই, কিশমিশ ইত্যাদি। এসবের মধ্যে ডালিম খুব দ্রুত রক্তে হিমোগ্লোবিন বাড়ায়।

ভিটামিন ‘সি’ সমৃদ্ধ খাবার। ভিটামিন ‘সি’ শরীরে অভাব হলেও রক্তে হিমোগ্লোবিন কমে যেতে পারে। সে কারণে কমলা, লেবু, স্ট্রবেরি, টমেটো, গোলমরিচে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে। এসবই লৌহ শোষণে সহায়তা করে। ফলে দ্রুত হিমোগ্লোবিন বাড়ায়।

আর ফলিক অ্যাসিড একপ্রকার ভিটামিন ‘বি’ কমপ্লেক্স। এটি লাল রক্তকণিকা তৈরিতে প্রয়োজনীয় উপাদান। সবুজ পাতাযুক্ত সবজি, কলিজা, ভাত, শিমের বিচি, বাদাম, কলা, সবুজ ফুলকপিতে প্রচুর পরিমাণে ফলিক অ্যাসিড পাওয়া যায়।

এ ছাড়া প্রাণিজ খাদ্যের মধ্যে আছে— কলিজা, ডিম, দুধ ও মাংস। এই প্রাণিজ খাদ্য থেকেও খুব সহজে হিমোগ্লোবিনে তৈরি হয় এবং তা শরীরে খুব দ্রুত শোষণ হয়। উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে সেই পরিমাণে হিম তৈরি হতে পারে না বলে প্রাণিজ উৎসকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়।

সূত্র: যুগান্তর

সকালে খালি পেটে দুধ চা পান করছেন, কী হয় জানুন

সকাল বেলা খালি পেটে চা পানে অভ্যস্ত অনেকেই। আবার অনেকেই আছেন যারা দুধ চা পান করতে বেশি পছন্দ করেন। আর সেই সুবাদে ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই ফ্রেশ হয়ে দুধ চা পান করেন অনেকেই। তবে এই অভ্যাস ভালো নাকি বিপজ্জনক তা কি জানা আছে আপনার?

যদিও চা অ্যান্টি অক্সিডেন্টের ভাণ্ডার। আর এই উপাদান শরীরে প্রদাহের প্রকোপ কমাতেও সাহায্য করে। এছাড়া চায়ে এমন কিছু উপাদান আছে যা ব্রেনে হ্যাপি হরমোন ক্ষরণ বাড়ায়। তাই চা পান করলে মনে খুশির অনুভূতি জাগে। এমনকি কাজে মনোসংযোগ করতেও খুবই সুবিধা হয়।

তবে খালি পেটে দুধ চা পান করাটাই নাকি বুদ্ধিমানের কাজ না, এমনটিই জানাচ্ছেন ভারতের পুষ্টিবিদ কোয়েল পাল চৌধুরী।

তার মতে, খালিপেটে দুধ চা পান করার অভ্যাস গ্যাস-অ্যাসিডিটির প্রকোপ বাড়াবে। এতে করে ক্রনিক গ্যাসট্রাইটিসের সমস্যার ঝুঁকিও বাড়বে। তাই এই বদঅভ্যাস দ্রুত ত্যাগ করুন।

কোয়েল পাল চৌধুরীর মতে, দুধ চা পানের তুলনায় লিকার চা (রং চা) পান করা বহুগুণে স্বাস্থ্যকর। এমনকি সকালে খালিপেটে লিকার চা পান করলে শারীরিক সমস্যার ফাঁদে পড়ার ঝুঁকিও তেমন থাকে না বললেই চলে। তবে লিকার চায়ে আবার বেশি চিনি মেশাবেন না। এই ভুলটা শুধরে নিলেই ওজন বশে রাখতে পারবেন। এমনকি কন্ট্রোলে থাকবে ডায়াবেটিসও।

দুধ চা কখন পান করবেন?

অনেকের দুধ চা ছাড়া চলে না। সেক্ষেত্রে খাবার খাওয়ার অন্তত ৩০ মিনিট পরে ১ কাপ দুধ চা পান করতে পারেন। এতে করে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা অতটা হবে না। আর দুধ চা তৈরির ক্ষেত্রে লো ফ্যাটযুক্ত দুধ ব্যবহার করুন। এই নিয়ম মেনে চললে ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকবে আবার কোলেস্টেরলও থাকবে বশে।

দিনে কত কাপ চা পান করবেন?

রং চা দিনে ৩-৪ কাপ পান করতে পারেন, অন্যদিকে দুধ চা ২ কাপের

মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখুন। এতে করে শরীরের তেমন ক্ষতি হবে না। এর বেশি রং চা বা দুধ চা পান করলে গ্যাস, অ্যাসিডিটি থেকে শুরু করে লিভার ও কিডনির মতো অঙ্গেরও ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। এমনকি বাড়তে পারে দুশ্চিন্তা ও অবসাদ।

সূত্র: ইত্তেফাক

যে লক্ষণে বুঝবেন হার্ট অ্যাটাক হতে পারে

হার্টের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য হার্টে পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহের প্রয়োজন পড়ে। হার্টে রক্ত সরবরাহকারী রক্তনালি যদি বন্ধ হয়ে যায় এবং এর ফলে যদি রক্ত হার্টে পৌঁছতে না পারে, তাহলে হার্টের মাংসপেশিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছতে পারে না। আর তখনই হয় হার্ট অ্যাটাক।

প্রতিবছর অসংখ্য মানুষ এভাবে মারা যায়।

এই সমস্যায় মৃত্যু হঠাৎ করে হলেও হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ কিন্তু অনেক আগে থেকেই জানান দেয়। শরীরে দীর্ঘ দিন লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও বেশির ভাগ মানুষের রোগটির পূর্ববর্তী লক্ষণ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা নেই। তাই হঠাৎ বিপদ দেখা দেয়। তাই অ্যাটাকের আগের উপসর্গ সম্বন্ধে জানা থাকা খুব জরুরি।

অ্যাটাক আগে জানান দেয়

হার্ট অ্যাটাকের পূর্ববর্তী লক্ষণ হিসেবে ভোররাতে হঠাৎ বুকের বাম দিকে অস্বস্তি ভাব, বুকে ব্যথা, আপার অ্যাবডোমিনাল অর্থাৎ পেটে ব্যথা, যাকে গ্যাসের ব্যথা ভেবে ভুল করা হয়, সেই ব্যথাটি বাঁ হাত ও পিঠে ছড়িয়ে পড়লে, চোয়ালে ব্যথা, বুকে ভারী ভাব, প্রচণ্ড ঘাম ইত্যাদি ৩০ মিনিটের বেশি সময় স্থায়ী হলে রোগীর হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ শুরু হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। অল্পতেই ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে যাওয়া, গ্যাস্ট্রো ইনটেস্টিনাল সমস্যার

মতো উপসর্গে দেরি না করেই তাড়াতাড়ি চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।

উপসর্গ দেখা গেলে কী করবেন

উপরোক্ত লক্ষণগুলো দেখা গেলে তাৎক্ষণিক ইসিজি করে প্রাথমিক রোগ নির্ণয় করা হয়। অনেক সময় ইসিজিতে ৫০ শতাংশ রোগীর সঠিক রিপোর্ট আসে না।

যে রোগীর হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ হয়েছে বলে অনুমান করা হয়, তার প্রথম ইসিজি রিপোর্ট সঠিক হলে আধঘণ্টা অন্তর অন্তর ইসিজি করে রিপোর্টে কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না, দেখা হয়।

স্নায়ুরোগের উপসর্গ কী

ইসিজিতে এসটি লেভেল বেড়ে যাওয়ার অর্থ হলো রোগীর হার্টের সমস্যা শুরু হয়ে গেছে। হার্টের পেশি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটা দেখার জন্য বুকে ব্যথা বা অস্বস্তির তিন ঘণ্টা পর ট্রপ-টি নামক পরীক্ষা করা হয়। যদি এই পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ আসে তবে নিশ্চিতভাবে রোগীর হার্ট অ্যাটাক শুরু হয়ে গিয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। তখন অতি সত্বর রোগীকে প্রয়োজনীয় ওষুধ দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে।

এই পর্যায়ে চিকিৎসা করলে সাময়িকভাবে হার্ট অ্যাটাক আটকানো সম্ভব। তা ছাড়া ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে ওয়াল মোশন অ্যাবনর্ম্যালিটিজ দেখে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।
সুস্থতায় যা মেনে চলবেন

হার্ট অ্যাটাকের মতো বড় বিপদকে প্রতিহত করার জন্য কিছু ভালো অভ্যাস রপ্ত করতে পারলে এর কবল থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। ডায়াবেটিস ও হাইপারটেনশন নিয়ন্ত্রণে রাখা, প্রতিদিন নিয়ম করে ব্যায়াম ও হাঁটাচলা করা, লিপিড প্রোফাইলে কোনো সমস্যা থাকলে সেটা পরীক্ষা করে নেওয়া ও চিকিৎসা করা, কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের ওষুধ নিয়ম করে খাওয়া উচিত। মেডিটেশন ও মর্নিং ওয়াক এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাইরের ফাস্ট ফুড, তৈলাক্ত খাবার, ধূমপান ও মদ্যপান সম্পূর্ণ বর্জন করলে ভালো।

উল্লেখ্য, মেয়েদের ক্ষেত্রে ৩৫ বছর বয়সের পর কন্ট্রাসেপটিভ পিল ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। এ ছাড়া হার্টের জন্য মিউজিক থেরাপি ও স্বাস্থ্যকর স্থানে ভ্রমণ খুবই উপকারী।

ঠান্ডা ভাত গরম করে খেলে কী হয় জানেন?

‘ভাতে মাছে বাঙালী’ প্রচলিত এ কথাতেই প্রমাণ মেলে ভাত ছাড়া বাঙালীকে ভাবা যায় না। গরম ভাতের সঙ্গে ভর্তা, ডাল, ডিম, মাছ, সবজি কিংবা মাংস। তবে প্রতিদিন ভাত রান্নার সময় অনেকেই সঠিক মাপ বোঝেন না। খাওয়ার পরে স্বাভাবিকভাবেই কিছু অবশিষ্ট থাকে।

আর সেই ভাত পুনরায় গরম করে খাওয়া হয় অনেক বাড়িতেই। এটি খাবার এবং সময় নষ্ট এড়ানোর সবচেয়ে সহজ উপায় বলে মনে হয়। কিন্তু এই অভ্যাস স্বাস্থ্যের জন্য ভালো তো নয়ই বরং ক্ষতিকর।

ভাতে থাকা ব্যাসিলাস নামক ব্যাকটেরিয়া ঘরের তাপমাত্রায় রান্না করে বেশিক্ষণ রেখে দিলে খুব দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে। পুনরায় ভাত গরম করলে এই ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস না হয়ে অন্যান্য ধরনের বিষাক্ত পদার্থ নির্গত করতে শুরু করে যা ডায়রিয়া এবং বমির কারণ হতে পারে।

শুধু তাই নয়, ভাত খুব বেশিক্ষণ ফ্রিজে রাখলে এটি ছত্রাকের বিষাক্ততা তৈরি করতে পারে- কারণ ছত্রাক আর্দ্র পরিবেশে বংশবৃদ্ধি করে। এটি লিভারের ক্ষতিকারক অ্যাফ্লাটক্সিন নির্গত করতে পারে।

এ পর্যায়ে ভাত খাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো গরম অবস্থায় এর উপরে কিছু ঘি দিয়ে খাওয়া।

অন্যথায় আপনি এটি এক ঘণ্টার জন্য বাইরে রাখতে পারেন এবং তারপর ঠান্ডা পানির পাত্রে ঠান্ডা করে সর্বোচ্চ ২৪ ঘণ্টা ফ্রিজে রাখতে পারেন। রান্না করা ভাত রাতারাতি ফ্রিজে রাখবেন না।

চলুন জেনে নেওয়া যাক ভাত পুনরায় গরম করার সঠিক উপায়-

১. যদি মাইক্রোওয়েভে ভাত গরম করেন, তাহলে প্রতি কাপ ভাতের জন্য

১ টেবিল চামচ পানি যোগ করুন এবং পানি শোষিত না হওয়া পর্যন্ত গরম করুন।

২. যদি রান্নার চুলায় ভাত গরম করেন, তাহলে পানি, তেল বা মাখন যোগ করে ভাজুন এবং শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত রান্না করুন।

সূত্র: ইত্তেফাক

এক মুড়িতেই নয় সমাধান

‘মুড়ি খান’— বাক্যটি ব্যবহার করা হয় ব্যাঙ্গাত্মকভাবে। সহজলভ্যও বোঝানো হয়। তবে হাতের কাছে সস্তায় পেয়ে যাওয়া এই মুড়ির অনেকগুণ। শুকনো খান, ভিজিয়ে কিংবা ছোলা-বুট-চানাচুর দিয়ে মেখে পুষ্টিগুণ কিন্তু কমে না। অল্প ক্ষিধেতে কার্যকরী এক মুঠ মুড়ি অজান্তেই সেরে দেয় অনেক রোগ।

চিকিৎসকদের মতে, মুড়ি ফাইবার সমৃদ্ধ। এটি খাওয়ার পর হজমশক্তি বাড়ে। ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যাওয়া ছাড়া এই খাবারে আর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। তাই সময় পেলেই মুড়ি খান। তার আগে জেনে নিন এর ক্ষমতা—

অ্যাসিডিটি রোধ করতেও সাহায্য করে মুড়ি। হজমের সমস্যা থাকলে এবং অ্যাসিডিটি হলে, মুড়ি খুবই উপকারি। নিয়মমাফিক
যদি মুড়ি খাওয়া যায়, তা হলে অ্যাসিডিটি কমবে। কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগলে, মুড়ি খাওয়া অনেক ভাল। এটি শরীরের
জন্য খুবই উপকারী কারণ এটি শরীরকে ভিটামিন বি দেয়।
মুড়িতে উচ্চ পরিমাণে শর্করা রয়েছে। যার ফলে এটি শরীরে শক্তি বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে।
শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি থাকলে অনেক গুরুতর অসুখ পিছু নিতে পারে।
এমনকি হার্টের অসুখ ও স্ট্রোক পর্যন্ত হতে পারে। এই রোগে ভুক্তভোগীরা নিশ্চিন্তে মুড়ি খেতে পারেন।
মুড়িতে নিয়াসিন, ফাইবার, ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম, আয়রনের মতো প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে। তাই দেহে পুষ্টির

ঘাটতি থাকলে তা পূরণ করতে পারে মুড়ি।
মুড়িতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি ও খনিজ লবণ থাকায় এটি
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। নিয়মিত মুড়ি চিবিয়ে খেলে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমে যায়।
দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্যও থাকে ভাল।
মুড়িতে আছে ক্যালসিয়াম, আয়রন যা হাড় শক্ত রাখতেও সাহায্য
করে।

কাঁচা হলুদের চা, এক টোটকায় বহু সমাধান

হলুদের সঙ্গে একটি প্রবাদ খুব মানায়, সর্ব ঘাটের কাঁঠালি কলা। পা কেটে গেছে, লাগাতে পারেন কাঁচা হলুদ বাটার পেস্ট। রান্না ঘরে হলুদ ছাড়া চলেই না। বিয়ে থেকে ত্বকের যত্ন হয়ে চিকিৎসা সবকিছুতেই দারুণ কার্যকর হলুদ।

পুষ্টিবিদেরা বলছেন, হলুদে রয়েছে কারকিউমিন নামক অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। যা শরীরে নানা ভাবে উপকারে লাগে। প্রদাহনাশক উপাদান রয়েছে হলুদে। এক কাজে শরীরের এত উপকার করতে হলে আপনাকে কাঁচা হলুদ খেতে হবে। চিবিয়ে নয়, চাইলে এটি পেস্ট করে খেতে পারেন। যদি সেটি সম্ভব না হয়, গন্ধ লাগে তবে আলাদা উপায়ও আছে।

বিশেষজ্ঞরা গুণ বিচারে কাঁচা হলুদ চা বা কফিতে দিয়ে খেতে বলেছেন। তাদের ভাষ্য, সকালে ঘুম থেকে উঠে বেশির ভাগ মানুষই চা কিংবা কফি খান। এই ধরনের পানীয়তে কাঁচা হলুদ মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে। তাতে কাঁচা হলুদের গন্ধ অনেকটা কমলেও গুণ একই থাকে।

যেভাবে তৈরি করবেন কাঁচা হলুদের চা

প্রথমে একটি পাত্রে পরিমাণ মতো পানি ফুটিয়ে নিন। পানি ফুটতে শুরু করলে তাতে আদা, দারচিনি, গোলমরিচ, লবঙ্গ, জয়ফল, কাঁচা হলুদ দিয়ে দিন। ভাল করে ফুটিয়ে গ্যাস বন্ধ করে দিন এবং কফি বা চা

মিশিয়ে নিন। এরপর বেশকিছু সময় ওভাবেই রেখে দিন। ঠান্ডা হলে পানি ছেঁকে কাপে ঢেলে নিলেই কাজ শেষ। হালকা গরম থাকতে থাকতে সাবাড় করে নিন। মিস্টি করতে চাইলে চিনি ছাড়াও মেশাতে পারেন মধু কিংবা গুড়। তাতে পুষ্টিগুণ এতটুকুও কমবে না।

সূত্র: যুগান্তর

সর্দি-কাশি ও অ্যালার্জিতে কষ্ট, জেনে নিন কোন ফলের রস খেলে উপকার

শীত এলেই সর্দি-কাশি আর অ্যালার্জির সমস্যা বেড়ে যায়। এতে শুধু ওষুধ খেলেও কমতে চায় না। আর অ্যালার্জির সঙ্গে আপস করা যায় না কোনোভাবেই। যারা ভুক্তভোগী, তারা জানেন কতটা মারাত্মক হতে পারে অ্যালার্জি। খাদ্যনালি, শ্বাসনালি বা চোখের মতো স্পর্শকাতর জায়গায় হলে তা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। বিশেষ করে ‘অ্যালার্জিক রাইনাইটিস’ হলে তো অবস্থা আরও গুরুতর। যাদের এ সমস্যা আছে, তারা লাগাতার সর্দি-কাশির সমস্যায় ভুগে থাকেন।

এ বিষয়ে চিকিৎসকরা বলেছেন, কেবল ওষুধ খেয়েই সমস্যার সমাধান হবে না। বরং নিয়মিত কয়েক রকম ফলের রস খেলে মিলবে উপকার। সর্দি-কাশি বা অ্যালার্জির মতো সমস্যা থাকলে খুব কার্যকরী হতে পারে আনারসের রস। আনারসে ব্রোমালেইন নামক এমন একটি উপাদান আছে, যা মিউকাসের ক্ষরণ বন্ধ করতে পারে। গলাব্যথা বা গলায় সংক্রমণ হলেও আনারসের রস কাজে আসতে পারে। তা ছাড়া আনারসে আছে ভিটামিন সি, যা ঠান্ডা লাগার ধাত কমায়। শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। ফলে একটুতেই সর্দি-কাশি কিংবা জ্বর বাঁধিয়ে বসার ভাবনা থাকে না।

আবার আনারস ছাড়াও মুসাম্বির রসও উপকারী। মুসাম্বি লেবুতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফ্ল্যাভোনয়েড। সে কারণে হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে দারুণ সাহায্য করে এ উপাদান। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন

সি। আপনার রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি সংক্রমণজনিত অসুখ থেকেও সুরক্ষা দিতে পারে মুসাম্বি। আর এতে থাকে অ্যান্টি-হিস্টামিন, যা অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের প্রকোপ কমাতে সাহায্য করে।

চিকিৎসকরা বলেন, রাইনাইটিস থাকলে ঠান্ডা লাগানো যাবে না কোনোভাবেই। ঠান্ডা লেগে গেলেই লাগাতার হাঁচি শুরু হবে। সর্দি-কাশি কমতেই চাইবে না। সেই সঙ্গে চোখ দিয়ে অনবরত পানি পড়তে থাকবে এবং চোখ ফুলে লাল হয়ে যাবে। চোখে-নাকের চারপাশে চুলকানিও হবে।

আবার অ্যালার্জিক রাইনাইটিস থেকে ত্বকের অ্যালার্জিও হয় অনেকের। ত্বক শুষ্ক হয়ে ফেটে যাওয়া, চুলকানি, খসখসে হয়ে যাওয়া এবং ফোস্কা পড়ার মতো সমস্যা দেখা দেয়, যাকে ‘অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস’ বলে। তাই ভিটামিন সি ও অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট আছে এমন খাবারই খেতে হবে।

সূত্র: যুগান্তর

যে ৪ মানুষের কাছে আমলকী বিষ

আমলকীর গুণমান দেখে অনেকে ফলটিকে সুপার ফুড বলে। ভেষজ জাতীয় এই ছোট্ট ফলে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি। আমলকী খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। কিন্তু আমলকী সবার জন্য অতটা উপকারী নয়। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ফলটি খাওয়া হয় না বা খুব কম পরিমাণে খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে চার ধরণের রোগে ভুগছেন এমন মানুষের জন্য এটি একেবারে এড়িয়ে চলা উচিত।

রক্তের ব্যাধি

যারা রক্তজনিত রোগে ভুগছেন তারা আমলকী না খাওয়াই ভালো। ফলটিতে এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা রক্তকে পাতলা করতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া আমলকী খাওয়া উচিত নয়।

হাইপার অ্যাসিডিটি

যাদের হাইপার অ্যাসিডিটির সমস্যা রয়েছে তাদের ফলটি এড়িয়ে যাওয়া সর্বোত্তম। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ আমলা খেলে এই ধরনের মানুষের পেটে বেশি অ্যাসিড তৈরি হতে থাকে। বহুবার দেখা গেছে আমলা খাওয়ার ফলে হাইপার অ্যাসিডিটি রোগীদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে।

অস্ত্রোপচারের আগে

যারা অস্ত্রোপচার করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য আমলকী খাওয়াও উপকারী বলে মনে করা হয় না। অস্ত্রোপচারের ২ সপ্তাহ আগে থেকেই ফলটি খাওয়া বন্ধ করা উচিত।

ব্লাড সুগার কম থাকলে

আমলকী রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে সহায়ক। এমন পরিস্থিতিতে যাদের রক্তে শর্করার মাত্রা কম তাদের জন্য এর খাওয়া মোটেও উপকারী নয়। ডায়াবেটিক রোগীরা যারা আমলকী খান তারাও তাদের সুগার লেভেল পরীক্ষা করে থাকেন।

সূত্র: যুগান্তর

‘চা’ না খেলে শরীরে কী হয়?

চা-প্রেম এক সর্বজনীন বিষয়। মানুষের মধ্যে চা-প্রীতি কতটা গভীর, তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দাঁত ব্রাশ করার পর চা পান করাই যেন আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাস। সেই অভ্যাস যদি হঠাৎ ছাড়েন, কী হতে পারে শরীরে? জানলে চমকে উঠবেন।

চা পান করার পর আমরা যেন নতুন শক্তি পাই। এই শক্তির উপর ভর করেই সারাদিনের কাজ করি। আমাদের জীবনে চা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দিনে এক-দু’কাপ চা পান করার মধ্যে কোনও দোষ নেই। তবে বেশি পরিমাণ চা পান করলে তা আমাদের শরীরে দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা তৈরি করতে পারে।

এমন পরিস্থিতিতে চা একেবারে বর্জন করাই কি ভাল? এক মাস চা না খেলে শরীরে কী ধরনের প্রভাব পড়বে? চলুন জেনে নিই-

চা সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়ার উপকারিতা

এক মাস চা না খেলে আমাদের শরীরে ক্যাফিন গ্রহণের মাত্রা কমে যায়। এর ফলে গভীর এবং উন্নতমানের ঘুম হয় এবং মানসিক চাপ কমে। চায়ের ডাইইউরেটিক প্রভাবের কারণে অতিরিক্ত চা পান আমাদের শরীরের পানিশূন্যতা তৈরি করে। তাই চা পান বন্ধ করলে ডিহাইড্রেশনের সমস্যা কমে।

চায়ের পরিবর্তে কী পান করা যেতে পারে?

যদি আপনি চা পুরোপুরি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তবে চায়ের পরিবর্তে হার্বাল চা, ফলের রস, বা গরম জল পান করতে পারেন। ক্যাফিন-মুক্ত হার্বাল চা যেমন গাঁদা ফুল বা পুদিনার চা শরীরে অনেক ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। আপেল বা ক্র্যানবেরি রসের মতো ফলের রস প্রাকৃতিকভাবে ক্যাফিনমুক্ত এবং শরীরকে সতেজ করতে সাহায্য করে। এছাড়া লেবু বা মধু মিশিয়ে গরম পানি পান করলেও চায়ের মতোই আরামদায়ক অনুভূতি পাওয়া যায়।

কারা চা একেবারে এড়িয়ে চলবেন?

কিছু মানুষকে একেবারেই চা পান করা উচিত নয়। যাদের পেট সংবেদনশীল বা হার্টবার্নের সমস্যা রয়েছে, তাদের ক্যাফিন এবং ট্যানিনযুক্ত চা এড়ানো উচিত। অন্তঃসত্ত্বা মহিলা বা স্তন্যদানকারী মায়েদের চা সীমিত পরিমাণে পান করার পরামর্শ দেওয়া হয়, কারণ অতিরিক্ত চা শিশুর ক্ষতি করতে পারে।

যারা আয়রনের অভাবে রক্তাল্পতায় ভুগছেন, তাদের চা পান করা উচিত নয়। চায়ের ট্যানিন শরীরে আয়রন শোষণ বাধাগ্রস্ত করে, যা রক্তাল্পতা বাড়াতে পারে।

উল্লেখ্য, আপনার স্বাস্থ্য বিবেচনা করে দিনে কতটা চা পান করা যেতে পারে বা আদৌ চা পান করা উচিত কিনা, তা জানার জন্য অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

সূত্র: যুগান্তর